h-o-r-o-p-p-a-হ-র-প্পা

Entries (RSS) Comments (RSS)

বৌদ্ধ তন্ত্র-০৭ : বৌদ্ধ-তন্ত্রসাধন

Posted by: Ranadipam Basu on: 29/10/2017

In: বৌদ্ধ-তন্ত্র মন্তব্য করুন

i
1 Votes

বৌদ্ধ তন্ত্র-০৭ : বৌদ্ধ-তন্ত্রসাধন

রণদীপম বসু

...

বজ্রযান, কালচক্রযান, সহজযান এই সবকটি বৌদ্ধ তান্ত্রিক-যানেরই নির্ভর মূলত যোগ-সাধনার উপর। বলা বাহুল্য, এদের সবারই দর্শনদৃষ্টির মূল যোগাচার ও মাধ্যমিক দর্শনে। একই ধ্যান-কল্পনা থেকেই এই তিন যান উদ্ভূত এবং ব্যবহারিক সাধনার ক্ষেত্রে এই তিন যানের মধ্যে পার্থক্যও খুব বেশি ছিলো না। এদের মধ্যে সূক্ষ্ম সীমারেখা টানা বস্তুতই কঠিন। তাছাড়া একই সিদ্ধাচার্য একাধিক যানের উপর পুস্তক রচনা করেছেন, এমন প্রমাণও দুর্লভ নয়। তবে এই তিন যানের উদ্ভব যেখানেই হোক, তৎকালীন বাঙলা অঞ্চলেই এগুলো লালিত ও বর্ধিত হয়েছিলো । প্রধানত এই ত্রিযানপন্থী বাঙালি সিদ্ধাচার্যরাই এই বিভিন্ন গুহ্য সাধনার গ্রন্থাদি রচনা ও দেবদেবীর ধ্যান-কল্পনা গড়ে তুলেছিলেন। অধ্যাপক নীহাররঞ্জন রায়ের অভিমত হলো, ‘বস্তুত এই তিন যানের ইতিহাসই পাল-চন্দ্র-কম্বোজ-পর্বের বাঙলার বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস।’

যে-যোগের উপর এই তিন তন্ত্র-যানের নির্ভর, সেই যোগ হঠযোগ নামে পরিচিত এবং মানবদেহের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম শারীর-জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। শরীরের নাড়ীপ্রবাহ ও তাদের উর্ধ্বমুখী গতি, বিভিন্ন নাড়ীর সংযোগ কেন্দ্র, তাদের উৎপত্তিস্থল, নাড়ীচক্র প্রভৃতি সমস্তই এই শারীর-জ্ঞানের অন্তর্গত। শাক্ত-তন্ত্রে মানবদেহের মধ্যে ষটচক্র বা ছয়টি স্নায়ুচক্রের কথা আছে। বৌদ্ধতন্ত্রে এই স্নায়ুচক্রের সংখ্যা তিনটি যেগুলি বুদ্ধের ধর্মকায়, সম্ভোগকায় ও নির্মাণকায়ের প্রতীক। এ ছাড়া আরও একটি চক্র আছে যা উষ্ণীষকমল বা সর্বোচ্চ মস্তিষ্কে অবস্থিত, যা বুদ্ধের বজ্রকায় বা সহজকায়ের প্রতীক। উষ্ণীষকমলের নিচে গ্রীবাপ্রদেশের তলায় সম্ভোগচক্র অবস্থিত, আরও নিচে হৃৎপিণ্ড অঞ্চলে ধর্মচক্র, এবং সবচেয়ে নিচে নাভিমূলে নির্মাণচক্র। দেহের অসংখ্য নাড়ীর মধ্যে যে তিনটি প্রধান গুরুত্বপূর্ণ, সেগুলির মধ্যে সুষুম্নাকাণ্ডের দু’পাশের দুটির নাম প্রজ্ঞা ও উপায়, নামান্তরে ললনা ও রসনা। এবং মধ্যেরটি, যেখানে ওই দুটি এসে মিলেছে, সহজ বা অবধূতী নামে পরিচিত। এই ললনা-রসনা-অবধূতীই শাক্ত-তন্ত্রের ইড়া-পিঙ্গলা-সুষুম্না নাড়ী। এই তিন নাড়ীপ্রবাহের মধ্যে অবধূতীর উর্ধ্বমুখী গতি ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত। শাক্ত-তন্ত্রের কুণ্ডলিনী শক্তির ন্যায় বৌদ্ধ-তন্ত্রে একটি অগ্নিময়ী নারীশক্তির কল্পনা আছে, যার বাস নির্মাণচক্রে এবং যা চণ্ডালী নামে পরিচিত। এই চণ্ডালী ধর্মচক্র ও সম্ভোগচক্রকে প্রজ্জ্বলিত করে উপর দিকে উঠতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত উষ্ণীষকমল বা মস্তিষ্ক অঞ্চলে উপস্থিত হয়ে আবার সেখান থেকে স্বস্থানে নেমে

আসে। যৌগিক ক্রিয়ার দ্বারা এই শক্তিকে প্রজ্ঞা ও উপায়রূপ নাড়ীদ্বয়ের মাধ্যমে উষ্ণীষকমলে নিয়ে যেতে পারলে অনন্তসুখ বা প্রকৃত নির্বাণের উপলব্ধি ঘটে। নাড়ীপ্রবাহের গতিকে সাধক স্বেচ্ছায় চালনা করতে পারেন এবং সেই চালনার শক্তি অনুযায়ী বোধিচিত্তের ধ্যান-দৃষ্টি উন্মীলিত ও প্রকাশিত হয়।

বৌদ্ধ-তন্ত্রের সাধনপন্থায় চক্রভেদ প্রসঙ্গে শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত বর্ণনা অনুযায়ী– 'হিন্দু-তন্ত্রের মধ্যে এবং বিবিধ যোগ-গ্রন্থের মধ্যে আমরা কুলকুণ্ডলিনী-শক্তির কথা জানিতে পারি; এই শক্তি সর্বনিম্ন চক্র বা পদ্ম মূলাধারে সর্পাকারে কুণ্ডলিত হইয়া নিদ্রিত আছে; সাধকের সর্বপ্রথম কাজ হইল এই সুপ্তা শক্তিকে জাগ্রত করিয়া তোলা। দেবী মূলাধারে জাগ্রত হইয়া উঠিবার পূর্ব পর্যন্ত সাধনায় সাধকের কোনও অনুভূতির স্পন্দনই নাই– দেবীর বা শক্তির জাগরণের সঙ্গে সঙ্গেই আরম্ভ হয় আনন্দময় অনুভূতির স্পন্দন। শক্তির জাগরণের পরেই আরম্ভ হয় তাঁহার উর্ধ্বগতি– একটি একটি করিয়া চক্রকে ভেদ করিয়া শক্তি উর্ধ্বে উত্থিত হন– সর্বোচ্চধামে সহস্রারে গিয়া শক্তির পরমা স্থিতি। শক্তির একটি একটি চক্রভেদের সঙ্গে সঙ্গে সাধকের নূতন নূতন আনন্দানুভূতির স্পন্দন লাভ হইতে থাকে; সেই আনন্দানুভূতির স্পন্দন চরমবিশুদ্ধি এবং পরমপূর্ণতা লাভ করে সর্বোচ্চধামে শক্তির স্থিতির সহিত। এই কুলকুণ্ডলিনী-শক্তির অধ্যাত্ম-রহস্যের গভীরে প্রবেশ না করিয়া সহজে দেখিতে পাই, যোগ-তন্ত্রাদিতে এই শক্তির উত্থান ও গতি একটি বিচিত্র-স্পন্দনাত্মক বিদ্যুৎ-প্রবাহের ন্যায় বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। এই প্রবাহের প্রতিক্ষণে সাধকের বিচিত্র দিব্যানন্দের অনুভূতি। বৌদ্ধ-তান্ত্রিক সাধনায়ও এই-জাতীয় একটি বিদ্যুৎ-প্রবাহবৎ স্পন্দনাত্মিকা শক্তির বর্ণনা দেখিতে পাই। এই শক্তির অভ্যুত্থানের সঙ্গে যে আনন্দানুভূতির আরম্ভ, মস্তকস্থিত উষ্ণীষকমলে পৌঁছিয়া তাহারই পরিণতি বৌদ্ধ-তান্ত্রিকগণের পরম কাম্য মহাসুখে। এই মহাসুখই সহজানন্দ। 'সহজ'ই হইল প্রত্যেক প্রাণীর– শুধু প্রাণীর নয়- সকল ধর্মের স্বরূপ; আর এই স্বরূপ হইল বিশুদ্ধ আনন্দ– তাহাই মহাসুখ; সুতরাং আনন্দই হইল সহজের নিত্য স্বভাব। বৌদ্ধ-তন্ত্রমতে দেহমধ্যে চারিটি চক্র বা পদ্ম অবস্থিত, নিম্নতম হইল নির্মাণচক্র, ইহা নাভিদেশে অবস্থিত; তদূর্ধ্বে হৃদয়ে হইল ধর্মচক্র, কণ্ঠে হইল সম্ভোগচক্র– আর মস্তকে উষ্ণীষকমলে হইল মহাসুখচক্র। নির্মাণচক্র শুধু নিম্নতম চক্র নয়– ইহাই স্থূলতম তত্ত্বের ক্ষেত্র। কিন্তু শক্তির জাগরণ প্রথমে এই নির্মাণচক্রের চৌষট্টি-দল-যুক্ত পদ্মে; এইখানে এই শক্তির জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে আনন্দের উদ্বোধন। কিন্তু তখন পর্যন্ত এই স্পন্দনাত্মক আনন্দ বিশুদ্ধ নহে– বিষয়ানন্দের সঙ্গে তাহা জড়িত; উর্ধ্বগতিতে এই আনন্দ পরমানন্দে, পরমানন্দ বিরমানন্দে, বিরমানন্দ সহজানন্দে পরিণতি লাভ করে; সহজানন্দের পরিপূর্ণ অনুভূতি উষ্ণীষকমলে। এই সহজানন্দদায়িনী শক্তিই হইলেন বৌদ্ধ-সহজিয়া– তথা বৌদ্ধ-তান্ত্রিকগণের দেবী; এইজন্য তিনি সর্বদাই সহজস্বরূপা বা সহজানন্দরূপিণী। এই সহজানন্দের মধ্যে চিত্তের সম্পূর্ণ বিলোপেই যথার্থ নৈরাত্ম্যে প্রতিষ্ঠা। তাই এই শক্তি নৈরাত্মারূপিণী বা আদরিণী 'নৈরামণি'। এই আনন্দরূপিণীর প্রথম উদ্বোধের পরে তাঁহাকে ক্রমে হৃদয়ে (ধর্মচক্রে) ধারণ– সেখান হইতে তাঁহাকে কণ্ঠে ধারণ (সম্ভোগচক্রে)– এই সমস্তের ভিতর দিয়াই দেবী বা যোগিনীর সহিত বজ্রধর সাধকচিত্তের সুরত-যোগ; এই সুরতযোগের পরিণতি দেহ-পর্বতের উচ্চশিখর উষ্ণীষকমলে অচ্যুত সহজানন্দের পূর্ণানুভূতিতে– সে অনুভূতিতে সাধকচিত্তের সহজ-স্বরূপিণীর ভিতরে সম্পূর্ণ বিলোপে অদ্বয় সামরস্যের উদ্ভব– তখনই দেবীসঙ্গে সর্বতোভাবে যুক্ত বজ্রধরের যুগনদ্ধস্থিতি।'- (ভারতের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য, পৃষ্ঠা-১৩৮-৩৯)

তবে এই গুরুমুখী সাধনা গুরুর মাধ্যমে এবং গুরুর কৃপা ছাড়া সফল হওয়া সম্ভব নয় বলে তন্ত্রে নির্দেশনা রয়েছে। হিন্দু-তন্ত্রে যেভাবে এই গুরুর অপরিহার্যতা বর্ণিত হয়েছে, বৌদ্ধ-তন্ত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। কিন্তু গুরুর পক্ষে শিষ্য নির্বাচন এবং তাকে যথার্থ সাধনপন্থায় চালনা করে নিয়ে যাওয়া খুব সহজ ছিলো না। এ-প্রেক্ষিতে অধ্যাপক নীহাররঞ্জন রায়ের পর্যবেক্ষণ হলো–
'সাধনমার্গের কোন্ পথে শিষ্যের স্বাভাবিক প্রবণতা গভীর বিচার করিয়া তাহা স্থির করিতে হইত। এই বিচার-বিশ্লেষণের অভিনব একটি পদ্ধতি তাঁহারা আবিষ্কার করিয়াছিলেন; এই পদ্ধতির নাম ছিল কুলনির্ণয়-পদ্ধতি। ডোম্বী, নটী, রজকী, চণ্ডালী ও ব্রাহ্মণী এই পাঁচ রকমের কুল। এই পাঁচটি কুল প্রজ্ঞার পাঁচটি রূপ। যে পঞ্চস্কন্ধ বা পঞ্চবায়ুর সারোত্তম দ্বারা এই ভৌতিক মানবদেহ গঠিত, ব্যক্তি বিশেষের দেহে তাহাদের মধ্যে যে স্কন্ধটি অধিকতর সক্রিয়, সেই অনুযায়ী তাহার কুল নির্ণীত হয় এবং তদনুযায়ী সাধনপন্থাও স্থিরীকৃত হয়। বৈষ্ণব পদকর্তা ও সাধক চণ্ডীদাসের রজকী বা রজকিনী বজ্রযান-সহজযান মতে চণ্ডীদাসের কুলেরই সূচক, আর কিছুর নহে।'- (বাঙালীর ইতিহাস আদিপর্ব, পৃষ্ঠা-৫২৯)

তন্ত্রসাধনার চক্রভেদ পর্যায়ের আলোচনায় শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্তের (ভারতের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য) বক্তব্যেও দেখি,– 'এই আনন্দসন্দোহ-রূপিণী শক্তির যখন প্রথম নির্মাণচক্রে জাগরণ তখন সহসা জ্বলিত অগ্নির ন্যায় তাঁহার প্রচণ্ড দাহন; সেই চণ্ডস্বভাবা দেবীকেই বলা হইয়াছে 'চণ্ডালী' ['চণ্ডালী জ্বলিতা নাভৌ'- হেবজ্রতন্ত্র]। আবার এই অতীন্দ্রিয় অনুভূতিরূপা দেবী ইন্দ্রিয় দ্বারা সর্বথা অস্পর্শা– এইজন্যই দেবী 'ডোম্বী' ['অস্পর্শা ভবতি যস্মাৎ তস্মাৎ ডোম্বী

প্রকীর্তিতা'- হেবজ্রতন্ত্র]। দেহরূপ নগরের বাহিরে অবস্থিত হইল এই ডোম্বীর কুঁড়েঘর– 'ব্রাহ্মণ-নাড়িয়া'র দল তাহাদের সকল আচার-বিচার ও পাণ্ডিত্যাভিমান লইয়া ইহাকে যেন ছুঁইয়া ছুঁইয়া যায়– ঠিক সঙ্গলাভ করিতে পারে না; সঙ্গলাভ করিতে পারে নিঘৃণ 'নাঙ্গ' (অর্থাৎ সর্ববিধ-আবরণ-রহিত) কপালিক যোগী। একটি হইল পদ্ম, চৌষট্টিটি তাহাতে পাপড়ি (নির্মানচক্রস্থিত চৌষট্টিদলযুক্ত পদ্ম), তাহাতে চড়িয়া নাচে এই 'ডোম্বী বাপুড়ী' [১০ম সংখ্যক চর্যা]। যে পর্যন্ত এই নির্মাণচক্রের পদ্মেই 'ডোম্বী'র আনন্দস্পন্দনের নৃত্য সে পর্যন্ত 'ডোম্বী' খুব ভাল নহে– কারণ তখনও বিষয়ানন্দের সঙ্গে বজ্রধর সাধকচিত্তের যোগ আছে; তাহার পরে নৃত্যের তালে তালে যখন ঊর্ধ্বায়ন আরম্ভ হইল তখন ডোম্বী আদরিণী হইয়া হৃদয়ে– পরে কণ্ঠে স্থান পাইল; উষ্ণীষকমলে গিয়া–
ডোম্বীএর সঙ্গে জো জোই রত্তো।
খুহ ণ ছাড়অ সহজ উন্মত্তো।।'

চর্যাপদাদিতে বর্ণিত এই সহজানন্দরূপিণী শক্তিরূপিণী দেবীর কল্পনা তথা সহজযানী বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের গূঢ় সাধন-পদ্ধতি ও ধ্যান-ধারণার সূক্ষ্ম গভীর পরিচয় দোহাকোষের দোহা এবং চর্যাগীতির গীতগুলিতে বিভিন্নভাবে বিভিন্নরূপে বিধৃত হয়ে আছে।

বৌদ্ধ মহাযান ধর্মের এই যে সহজযানে বিরাট বিবর্তন তার নেতৃত্ব যাঁরা গ্রহণ করেছিলেন, সমসাময়িক বৌদ্ধ ঐতিহ্যে তাঁদেরকেই বলা হয়েছে সিদ্ধ বা সিদ্ধাচার্য। এঁদেরকে চুরাশি-সিদ্ধাও বলা হয়। চুরাশি জন সিদ্ধাচার্যের সবাই ঐতিহাসিক ব্যক্তি কিনা বলা কঠিন, তবে তাঁদের অনেকেই যে ঐতিহাসিক ব্যক্তি এবং নবম থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যে তাঁরা জীবিত ছিলেন সে-সম্বন্ধে সন্দেহের কোন কারণ নেই বলে অধ্যাপক নীহাররঞ্জন রায়ের অভিমত। কেননা,–
'অনেকে অনেক গ্রন্থও রচনা করিয়াছিলেন এবং তাহাদের তিব্বতী অনুবাদ আজও বিদ্যমান। ইহাদের মধ্যে সরহপাদ বা সরহবজ্র, নাগার্জুন, লুইপাদ, তিল্লোপাদ, নাড়োপাদ, শবরপাদ, অদ্বয়বজ্র, কাহ্নপাদ, ভুসুকু, কুক্কুরিপাদ প্রভৃতি সিদ্ধাচার্যেরাই প্রধান। বৌদ্ধ ঐতিহ্যানুযায়ী সরহের বাড়ি ছিল পূর্ব-ভারতের রাঞ্জী-শহরে; তিনি ছিলেন রত্নপালের সমসাময়িক। উড্ডিয়ানে তাঁহার তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা এবং আচার্যের পদ অধিকার করিয়াছিলেন নালন্দা-মহাবিহারে। নাগার্জুন ছিলেন সরহপাদের শিষ্য এবং নালন্দায় তাঁহার দীক্ষা হইয়াছিল। তিল্লোপাদের বা তৈলিকপাদের বাড়ি ছিল চট্টগ্রামে, তাঁহার বংশ ব্রাহ্মণ বংশ; তিনি ছিলেন মহীপালের সমসাময়িক এবং পণ্ডিত-বিহারের অধিবাসী। নাড়োপাদ জয়পালের সমসাময়িক ছিলেন, বাড়ি ছিল বরেন্দ্রীতে এবং প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক জেতারির তিনি শিষ্য ছিলেন। নাড়োপাদ প্রথমে ছিলেন ফুল্লহরি-বিহারে; পরে বিক্রমশীল-বিহারের অধিবাসী হন। ভুসুকুর বাড়ি ছিল বিক্রমপুরে এবং তিনি ছিলেন অতীশ-দীপঙ্করের শিষ্য। লুইপাদও বোধ হয় বাঙালী ছিলেন, যদিও পাগ-সাম-জোন-জাং-গ্রন্থে তাঁহাকে বলা হইয়াছে 'উড্ডিয়ান-বিনির্গত'। অবধূতপাদ অদ্বয়বজ্র সম্বন্ধেও প্রায় একই কথা বলা চলে। কুক্কুরিপাদ ছিলেন বাঙলার এক ব্রাহ্মণ-পরিবার হইতে উদ্ভূত, পরে বৌদ্ধতন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া ডাকিনীদের দেশ হইতে মহাযানতন্ত্র উদ্ধার করিয়া আনেন। শবরপাদ ছিলেন সরহপাদের শিষ্য; সিদ্ধপূর্বজীবনে তিনি ছিলেন বঙ্গালদেশের পার্বত্যভূমির একজন শবর। ত্যাঙ্গুরে অবশ্য শবরীপাদের বাড়ি যেন ইঙ্গিত করা হইয়াছে মগধে।'- (বাঙালীর ইতিহাস আদিপর্ব, পৃষ্ঠা-৫৩০)
…
(চলবে…)
…
[আগের পর্ব : বৌদ্ধ-তন্ত্রের ক্রমবিকাশ] [*] [পরের পর্ব : হঠযোগ]
…

ট্যাগ সমুহঃ অবধূতী, ইড়া, উষ্ণীষকমল, কালচক্রযান, কুণ্ডলিনী, গুরু, চক্র, চক্রভেদ, তন্ত্র, দেব, দেবী, ধর্মচক্র, নাভিমূল, নাড়ী, নাড়ীচক্র, নির্মাণচক্র, পিঙ্গলা, বজ্রকায়, বজ্রযান, বৌদ্ধ, যোগ, রসনা, ললনা, শিষ্য, ষটচক্র, সহজকায়, সহজযান, সহস্রার, সাধন, সুষুম্না, স্নায়ুচক্র, হঠযোগ
Create a free website or blog at WordPress.com.